ATHENA, VOLUME IV, JULY 2020 C.E. (ISSN: 2454-1605) pp. 121-126
www.athenajournalcbm.in

স্বাধীনোত্তর ভারতবর্ষে কুটির শিল্পের বিকাশ: প্রসঙ্গ জওহরলাল নেহরু

সুজিত রাজবংশী*

প্রাপ্ত: ০১/০৫/২০২০ পরিমার্জন: ০৬/০৬/২০২০ গৃহীত: ০২/০৭/২০২০

সারসংক্ষেপ: *স্বদেশী আন্দোলনের সময় বিদেশি দ্রব্য বর্জনের সঙ্গে সঙ্গেই আন্দোলন জেগে উঠেছিল কুটির শিল্পকে নবরূপে বিকশিত করার জন্য। ক্ষুদ্র শিল্প বা কুটির শিল্প স্বাধীনতা আন্দোলনের যুগ থেকে গান্ধীজী এবং অন্যান্য নেতৃবৃন্দের কাছেও ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। প্রতীকী কর্মসূচি হিসেবে গান্ধীজী প্রবর্তিত খাদি, সুতো কাটা এবং তাঁত বোনার মতো কর্মসূচি অর্থনৈতিক উৎপাদনের ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত পরিসরকে যেমন জোরদার করেছিল তেমনি প্রাক শিল্পায়নের যুগে দেশকে এগিয়ে নিয়ে যেতে সাহায্য করেছিল। কিন্তু শিল্পায়নের ব্যাপারে গান্ধী ও নেহরু —দুজনের দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য ছিল সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। গান্ধী বারবার বলেছেন, তিনি সেভাবে যন্ত্রের বিরুদ্ধে নন তবে তিনি মনে করতেন, দেশের সমকালীন অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে যন্ত্র বেমানান। তিনি চেয়েছিলেন, মানুষ যন্ত্রের প্রভু হবে, দাস হবে না। কিন্তু দেশ গঠনের ক্ষেত্রে নেহরু বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উন্নয়নকে একটি চ্যালেঞ্জ হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন। ভারতীয় অর্থনীতি ও সামাজিক সমস্যার উন্নয়নে তিনি বিজ্ঞানকে প্রয়োগ করেছিলেন। ভারতের উৎপাদন ব্যবস্থার আধুনিকীকরণ করতে প্রযুক্তির উন্নয়ন ছিল আবশ্যক। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির দ্রুত উন্নয়নের ফলে দারিদ্র, অশিক্ষা, অস্বাস্থ্য, কুসংস্কার প্রভৃতি সমস্যা থেকে মুক্তি পাওয়ার দিশা মিলেছিল। তিনি সংসদীয় গণতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা, সামাজিক ন্যায়বিচার এবং সর্বোপরি একটি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি নির্ভর আর্থসামাজিক কাঠামোর বুনিয়াদ গড়ে তুলেছিলেন। আর্থসামাজিক কাঠামোর এই বুনিয়াদ গড়ে তুলতে তিনি একদিকে যেমন ভারী শিল্পকে গুরুত্ব দিয়েছিলেন, অন্যদিকে ক্ষুদ্র শিল্পকেও গুরুত্ব দিয়েছিলেন। তাঁর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ভাবনা স্বাধীন ভারতের উন্নয়নে এক নতুন দিশা দেখিয়েছিল। দেশ গঠনের ক্ষেত্রে তাঁর এই বিজ্ঞানমনস্ক চিন্তা-ভাবনা অবিস্মরণীয়।*

সূচক শব্দ: *কুটির শিল্প, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, চরকা, খাদি, ক্ষুদ্র শিল্প, সমাজতন্ত্র, পুঁজিবাদ।*

* সহকারী অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ, নয়াগ্রাম পণ্ডিত রঘুনাথ মুর্মু গভর্নমেন্ট কলেজ, ঝাড়গ্রাম।
e-mail: rajsujit0803@gmail.com

ক্ষুদ্র শিল্প বা কুটির শিল্প স্বাধীনতা আন্দোলনের যুগ থেকে গান্ধীজী এবং অন্যান্য নেতৃবৃন্দের কাছেও ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। স্বদেশী আন্দোলনের সময় বিদেশি দ্রব্য বর্জনের সঙ্গে সঙ্গেই আন্দোলন জেগে উঠেছিল কুটির শিল্পকে নবরূপে বিকশিত করার জন্য। গ্রামোদ্যোগের আন্দোলনে খাদি ও কুটির শিল্পের নবরূপায়ণ একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হয়ে উঠেছিল। প্রচলিত চরকার শ্লথ গতি ও উৎপাদনশীলতার অভাব খাদি উৎপাদনে যে স্থিরতা এনেছিল তা দূর করার জন্য গান্ধীজী নিজেই যারবেদা কারাগারে বসে বহু গবেষণা ও পরীক্ষা-নিরীক্ষার পরে এক নতুন চরকার উদ্ভাবন করেছিলেন। দ্রুত ঘুর্ণনে সক্ষম ও ওজনে হালকা এই চরকাটি অল্পদিনের মধ্যেই জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। গ্রামে গ্রামে এই চরকার ব্যাপক প্রচলন স্বদেশী আন্দোলনের ক্ষেত্রে সেদিন এক নতুন আলোর সন্ধান দিয়েছিল। গান্ধীর নেতৃত্বে কংগ্রেস দীর্ঘদিন ধরে গ্রামীণ শিল্পের পুনরুজ্জীবনের ওপর গুরুত্ব দিয়ে এসেছিল বটে, কিন্তু বৃহৎ শিল্পের উন্নয়নের ব্যাপারেও কংগ্রেস কখনো বিরোধিতা জ্ঞাপন করেনি। আইনসভায় কিংবা অন্যত্র যখনই সুযোগ পেয়েছে কংগ্রেস, শিল্পের উন্নয়নে আগ্রহ দেখিয়েছে। কুটির শিল্পের উন্নয়নের ওপর জোর দিয়ে ভারতের শিল্পায়নের পক্ষপাতী ছিল কংগ্রেস। জাতীয় পরিকল্পনা কমিটি নিয়োগের মধ্যে দিয়েই পরিকল্পিত উন্নয়নের ওপর কংগ্রেসের আস্থা প্রদর্শিত হয়। আর শিল্পায়ন এই পরিকল্পিত উন্নয়নের অন্তর্ভুক্ত ছিল।

গান্ধীজী প্রতীকী এবং সত্যিকারের সুতো কাটার ওপর জোর দিয়েছিলেন। কিন্তু সেই সময় সর্বভারতীয় রাজনৈতিক আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে দাঁড়িয়ে তৎকালীন ভারতে এর বিরুদ্ধে পাল্টা জোরালো যুক্তি দেওয়ার মত কেউ ছিল না। কিন্তু আধুনিক মানসিকতা নিয়ে জওহরলাল নেহরু সুতো কাটার গুরুত্ব এমনকি সুতো কাটার নাগরিক অধিকারের প্রয়োজনীয়তাকে উপলব্ধি করেছিলেন ঠিকই কিন্তু তার সাথে সাথে তিনি এটাও মনে করতেন গান্ধীজী মূলত কৃষিপ্রধান ভারতের মনোভাবের প্রতিফলন ঘটিয়েছিলেন এই আন্দোলনের মাধ্যমে। সুতরাং গান্ধীজী যে আন্দোলনকে পরিচালিত করেছিলেন তা ছিল প্রধানত কৃষক ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর। শিল্পায়নের ওপর এবং শ্রমিক শ্রেণীর বিপ্লব ঘটানোর সম্ভাবনার ওপর গুরুত্ব ছিল কম।[১]

এছাড়া প্রথম বিশ্বযুদ্ধের শেষ থেকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভের পূর্ব পর্যন্ত ব্রিটিশ সরকার মূলত ভারতীয় কৃষি ও চিকিৎসা শাস্ত্রে বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও জ্ঞান অর্জনের ওপর গুরুত্ব দিয়েছিলেন। কারণ ভারতের কৃষি ছিল ইংল্যান্ডের শিল্পের জন্য প্রয়োজনীয় কাঁচামালের জোগানদার আর ইংল্যান্ডের শাসক শ্রেণী ও বণিক শ্রেণীর বসবাস যেহেতু ভারতে, ফলে তাদের স্বাস্থ্যকে ভালো রাখার জন্য প্রয়োজন ছিল উন্নত চিকিৎসা ব্যবস্থার। এইসমস্ত কারণে ব্রিটিশ সরকারের সময়কালে 'ভারতীয় কৃষি গবেষণা পরিষদ' (I. C. A. R.) এবং 'ভারতীয় গবেষণা সমিতি' (I. R. F. A) স্থাপিত হয়েছিল।[২] আর এই কারণে তিনি একদিকে যেমন ভারী শিল্পকে গুরুত্ব দিয়েছিলেন, অন্যদিকে ক্ষুদ্র শিল্পকেও গুরুত্ব দিয়েছিলেন।[৩] স্বাধীনতার পরবর্তী সময়ে সরকার ক্ষুদ্র শিল্পের স্বার্থ রক্ষার জন্য এবং ক্ষুদ্র শিল্পের দ্রুত বিকাশের সুবিধার জন্য একাধিক নীতিমালা তৈরি করেছিল। আর এই নীতিমালাগুলি অনুসরণ করে সরকার সময়ে সময়ে বিভিন্ন সহায়তার ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিল যার মধ্যে সংরক্ষণ, বিনিয়োগের পরিমাণ বৃদ্ধি, প্রযুক্তির আধুনিকীকরণ, বিপণন সহায়তা ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল।

১৯৫১ সাল থেকে ভারতে শিল্পায়নের যে অনুকূল পরিবেশ তৈরি হয়েছিল তা ছিল ভারতীয় অর্থনৈতিক উন্নয়নের এক আকর্ষণীয় বৈশিষ্ট্য। শিল্পের উৎপাদন প্রায় পাঁচগুণ বৃদ্ধি পেয়েছিল, ভারতকে বিশ্বের দশম বৃহত্তম শিল্পায়িত দেশে পরিণত করেছিল। জাতীয় অর্থনীতি বিকাশের ক্ষেত্রে ক্ষুদ্র শিল্পও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। এই ক্ষুদ্র শিল্প একদিকে যেমন ভারতের বেকার সমস্যার সমাধান করেছিল তেমনি দেশের প্রয়োজনীয় প্রাথমিক চাহিদাগুলিও পূরণ করতে সক্ষম হয়েছিল। এই প্রসঙ্গে জওহরলাল নেহরু বলেছিলেন, 'ভারতে ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের একটি বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে। আমাদের যদিও মূলধনের অভাব রয়েছে কিন্তু আমাদের জনবলের অভাব নেই। আর এই মানব সম্পদ একদিকে

যেমন দেশের সম্পদ বৃদ্ধি করতে সাহায্য করবে তার পাশাপাশি ক্ষুদ্র শিল্পগুলি বেকার সমস্যাকে হ্রাস করতে সাহায্য করবে'।[৪] এছাড়াও ক্ষুদ্র-শিল্পগুলি আঞ্চলিক ভারসাম্য বজায় রাখে। প্রত্যন্ত অঞ্চল সহ দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বিকেন্দ্রীভূত উন্নয়নের সুবিধার্থে ক্ষুদ্র শিল্পের জন্য প্রয়োজনীয় কাঁচামাল ও অন্যান্য সম্পদ যেমন সহজে পাওয়া যায় তেমনি স্থানীয়ভাবে ক্ষুদ্র শিল্পের শ্রমিকও সহজে পাওয়া যায়।

এই কারণে বৃহত্তর ও মাঝারি শিল্পের পাশাপাশি ক্ষুদ্র শিল্পগুলিকেও গুরুত্ব দেওয়া হয়েছিল। ক্ষুদ্র শিল্পগুলির সমস্যা এবং সেই সমস্যার সমাধানের তথ্য অনুসন্ধানের জন্য ভারত সরকার বিভিন্ন সময় বিভিন্ন কমিটি গঠন করেছিলেন। এই কমিটি ক্ষুদ্র শিল্পের উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন রকম সমাধানের কথাও বলেছিলেন। তবে এক্ষেত্রে সব থেকে বেশি যেটা গুরুত্ব পেয়েছিল তা হল শিল্পের বিপণন সম্পর্কিত। স্বাধীনতার পর ভারত সরকার কর্তৃক 'ইন্ডাস্ট্রিয়াল কনফারেন্স'-এর সুপারিশ করা হয়েছিল এবং সেই কনফারেন্সের ভিত্তিতে ১৯৫২ সালে স্মল-স্কেল ইন্ডাস্ট্রিয়াল বোর্ড (Small-Scale Industrial Board) গঠন করা হয়েছিল। এই বোর্ডটিকে দেশের সমস্ত শিল্পগুলি নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা অর্পণ করা হয়েছিল। পরবর্তীকালে ১৯৫৫ সালে ছোট ছোট ইউনিট বা ক্ষুদ্র শিল্পগুলিকে সহায়তা করার জন্য জাতীয় ক্ষুদ্র শিল্প কর্পোরেশন বা National Small Industries Corporation (NSIC) গঠন করা হয়েছিল।[৫] এই কর্পোরেশনকে ছোট আকারের ইউনিটগুলিতে উচ্চ ব্যয়ের মেশিন ক্রয় ও তার ব্যবহারের জন্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকাও প্রদান করা হয়েছিল। দ্বিতীয় পরিকল্পনার সময়ে (১৯৫৬-১৯৬১) সরকারকর্তৃক গৃহীত আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ ছিল Small Industries Service Institutes (SISI) (এস.আই.এস.আই.) প্রতিষ্ঠা করা, যার উদ্দেশ্য ছিল ক্ষুদ্র শিল্পের সমস্যাগুলি খুঁজে বের করা ও তার সমাধান করা।[৬] তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় (১৯৬১-৬৬) ক্ষুদ্র-শিল্প খাতে গুরুত্ব বৃদ্ধি পেয়েছিল। এইসময় এই ক্ষুদ্র শিল্প ১২ মিলিয়ন জনগণকে কর্মসংস্থান প্রদান করেছিল এবং দেশের মোট রপ্তানি প্রায় ২৫ শতাংশ বৃদ্ধি করেছিল। মোট শিল্প উৎপাদনের প্রায় এক-তৃতীয়াংশ ছিল ক্ষুদ্র শিল্প জাত। সুতরাং বেকার সমস্যার সমাধান এবং ভারী শিল্পের বিকাশের প্রেক্ষাপট তৈরিতে ভারতের মত উন্নয়নশীল দেশে ক্ষুদ্রশিল্পগুলি একটি গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র হিসাবে কাজ করেছিল।

এর পাশাপাশি অর্থনৈতিক উন্নয়নের ক্ষেত্রেও এই ক্ষুদ্র শিল্পগুলি খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। প্রতীকী কর্মসূচি হিসেবে গান্ধীজী প্রবর্তিত খাদি, সুতো কাটা এবং তাঁত বোনার মত কর্মসূচি অর্থনৈতিক উৎপাদনের ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত পরিসরকে যেমন জোরদার করেছিল তেমনি প্রাক শিল্পায়নের যুগে দেশকে এগিয়ে নিয়ে যেতে সাহায্য করেছিল। কিন্তু শিল্পায়নের ব্যাপারে গান্ধী ও নেহরু - দুজনের দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য ছিল সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। আর কংগ্রেসিদের মধ্যেও এই মতবিরোধের ছাপ পড়েছিল। যন্ত্রপাতি ব্যবহারের ব্যাপারে গান্ধীর দৃষ্টিভঙ্গি সম্ভবত ক্রমশ বদলে যাচ্ছিল। তিনি বলতে চেয়েছিলেন, যন্ত্রপাতি নিয়ে ক্ষ্যাপামিতেই তাঁর আপত্তি, যন্ত্রপাতিতে নয়। বড় মেশিনপত্র ক্ষমতা ও সম্পদের কেন্দ্রীভবন ঘটায় বলে গান্ধীর ধারণা ছিল। তিনি কয়েক ধরনের ভারী শিল্পকে রাষ্ট্রায়ত্ত করার পক্ষে ছিলেন। তাঁর বক্তব্য ছিল, অত্যাবশ্যক কুটির শিল্পের ক্ষেত্রে রাষ্ট্র হস্তক্ষেপ করবে না। গান্ধী দৃঢ়তার সঙ্গে বলেছিলেন যে, শিল্প কর্মসূচি তিনি গ্রহণ করতে প্রস্তুত কিন্তু তা অবশ্যই অর্থনৈতিক সমতার শক্ত ভিতের ওপর গড়ে তুলতে হবে। সারা বিশ্ব যেখানে বৃহদায়তন শিল্পের অনুকূলে সিদ্ধান্ত নিয়েছে সেখানে ক্ষুদ্র শিল্প এবং বৃহৎ শিল্পের আপেক্ষিক গুণ নিয়ে তর্ক বিতর্ক জওহরলাল নেহরুর কাছে অপ্রাসঙ্গিক বলে মনে হয়েছিল। এপ্রসঙ্গে জওহরলাল নেহরুর মনে হয়েছিল টমাস পেইন এবং বার্ক সম্পর্কে একটি উক্তির কথা: 'পাখির পালকের জন্য তাঁর খেদ হচ্ছিল অথচ তিনি ভুলে যাচ্ছিলেন মরণাপন্ন পাখিটির কথা'। অর্থাৎ গান্ধী মরণোন্মুখ পাখিটির কথা ভোলেননি ঠিকই, কিন্তু তার পাখাগুলোর ব্যাপারে তিনি এত বেশি গুরুত্ব দেখাচ্ছেন কেন এটাই তার প্রশ্ন।[৭]

সাময়িক ব্যবস্থা হিসেবে কুটির শিল্প প্রয়োজনীয় উদ্দেশ্য সাধন করেছিল এবং কিছুদিনের জন্য এই শিল্প কাজেরও

হয়েছিল যতদিন না সরকার নিজে দেশব্যাপী কৃষিজমি ব্যবস্থা ও শিল্প সমস্যার সঠিক সমাধানের উদ্যোগ নিতে সক্ষম হয়েছিল। গান্ধী কৃষকদের জাগ্রত করেছিলেন এবং মধ্যবিত্ত শ্রেণীর আশা-আকাঙ্ক্ষাকে উদ্দীপ্ত করেছিলেন। স্বাধীনতা আন্দোলনে গতি সঞ্চার করতে সেটাই যথেষ্ট ছিল।[৮] এমনকি স্বাধীনতার পরেও উচ্চতর আর্থিক অবস্থার পরিবর্তন সহজসাধ্য করার সহায়ক আন্দোলন হিসেবেও খাদি শিল্পকে অব্যাহত রাখার প্রয়োজন ছিল।[৯] কিন্তু ভূমি ব্যবস্থার পূর্ণাঙ্গ পুনর্বিন্যাসও শিল্পের ক্রম উন্নয়ন ছিল আবশ্যক। গান্ধী বারবার বলেছেন, তিনি সেভাবে যন্ত্রের বিরুদ্ধে নন। তবে তিনি মনে করতেন, দেশের সমকালীন অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে যন্ত্র বেমানান। তিনি চেয়েছিলেন, মানুষ যন্ত্রের প্রভু হবে, দাস হবে না।[১০] কিন্তু মূল শিল্পগুলি তো বটেই, অপেক্ষাকৃত কম ভারী শিল্পগুলিও গুটিয়ে ফেলা হবে না। আর শিল্পায়নের প্রক্রিয়াও থামানো যায় না। যদিও কোনও কোনও কংগ্রেস নেতা শিল্পায়নের ব্যাপারে ভীত ছিলেন। কারণ তাদের কল্পিত ধারণা ছিল, বিপুল হারে উৎপাদন শিল্পোন্নত দেশগুলি সংকটের কারণ। কিন্তু বিপুল হারে উৎপাদনের কোন দোষ ছিল না, বরং সমস্যা ছিল যথাযোগ্য বণ্টন ব্যবস্থার অভাবের। ভারতের কৃষি ও শিল্পের সমস্যার সমাধানের ক্ষেত্রে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ব্যবহার ছিল বাঞ্ছনীয়। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির দ্বারা পরিবর্তন কীভাবে ঘটাতে হবে এবং কীভাবে সমস্যার বাধা দূর করতে হবে তা নিয়ে জহরলাল চিন্তা করেছিলেন। তাঁর বিরোধ ছিল চলতি ব্যবস্থার সঙ্গে, ব্যক্তি বিশেষের সঙ্গে নয়। আর চলতি ব্যবস্থাকে পাল্টানো দরকার আছে বলে তিনি মনে করতেন। তালুকদার ব্যবস্থা, সামন্ত রাজাদের প্রতি মনোভাব এবং দেশীয় রাজ্যগুলির প্রজাদের আন্দোলন ইত্যাদির মত অন্যান্য বিষয়েও গান্ধী এবং জওহরলাল নেহরুর মধ্যে মতপার্থক্য ছিল। তবে সাথে সাথে একথাও ঠিক ভারতে সেই সময় মূলত দরিদ্র সাধারণ মানুষের সংখ্যাই ছিলবেশী ফলে আধুনিক প্রযুক্তি ও যন্ত্র ব্যবহার করার মত সামর্থ তাদের ছিল না। তার ফলে সম্পদ ও প্রযুক্তির ব্যবহারের ক্ষেত্রেও অসুবিধা ছিল। আর সেই কারণে ভারতের অর্থনৈতিক পরিকল্পনার সাহায্যে ভারতকে আর্থিক দিক থেকে একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ রাষ্ট্র হিসাবে গড়ে তোলার উদ্দেশ্য নেহরু ভারতে পরিকল্পনা কমিশন গঠন করেছিলেন। এই কমিশন কৃষির পাশাপাশি ভারী শিল্পের উন্নয়নের উপরও গুরুত্ব দিয়েছিল।[১১]

স্বাধীনতা লাভের পর জওহরলাল নেহরু দেশ গঠনের ক্ষেত্রে প্রধানমন্ত্রী হিসাবে মূলত সময় পেয়েছিলেন সতের বছর (১৯৪৭-১৯৬৪), আর এই পর্বে তিনি নানা ধরনের মানুষের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন, নানা আদর্শের টানা-পোড়েনের সম্মুখীন তাঁকে হতে হয়েছিল। কিন্তু যখন তিনি তাঁর নিজস্ব ধারণার ভিত্তির ওপর দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত, তখন সেই ধারণাকে তিনি ব্যাপ্ত করে দিয়েছিলেন বিপুল কর্মকাণ্ডে। নেহরু স্বাধীন ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী ও জোট নিরপেক্ষ নীতির প্রবর্তক হিসাবেই বেশি আলোচিত হয়েছেন, একজন লেখক-দার্শনিক হিসেবে তাঁর পরিচিতি সেই সময় ছিল নিতান্তই গৌণ। কিন্তু জীবনের এই পর্বে নেহরুর বক্তৃতামালা বিশ্লেষণ করলে, তাঁর অনুসৃত রাষ্ট্রীয় নীতিকে বিচার করলে এবং বিরোধীদের সঙ্গে তাঁর নীতিগত পার্থক্যের প্রতি দৃষ্টিপাত করলে নেহরুর আর্থ-সামাজিক দর্শনকে বুঝে নিতে খুব অসুবিধা হওয়ার কারণ নেই। নেহরুবাদ কোনও গ্রন্থে বা পত্র-পত্রিকাতে লিপিবদ্ধ হবার সুযোগ পায়নি, সুযোগ থাকলেও চিরদিনের জন্য কোনও নীতির নির্দেশ ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য রেখে যাওয়া নেহরুর মতো সংশয়াকুল মানুষের পক্ষে হয়তো বা অসম্ভবই ছিল। তবু নেহরুর অনুসৃত নীতিগুলির সমর্থনে কিছু তাত্ত্বিক আলোচনা নানা প্রসঙ্গে উত্থাপিত হয়েছে এবং ধরে নেওয়া যায় যে, নিজের মনের সঙ্গে নেহরু কোন মিথ্যাচারণ করেননি। নীতি যদি তত্ত্বের ফলশ্রুতি হয়, তবে নেহরুবাদের অস্তিত্বকে অস্বীকার করা যায় না।[১২]

পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু স্বাধীনতা লাভের অব্যবহিত পরেই দেশ গঠনের যে বিশাল কর্মযজ্ঞের সূচনা করেছিলেন, সেই কর্মধারার প্রধানত দুটি দিক ছিল। দেশের সামগ্রিক বৈষয়িক উন্নতির জন্য পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা প্রণয়ন ছিল একটা দিক। আর দেশের আর্থ-সামাজিক অগ্রগতি ও জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন ছিল এই কর্ম প্রয়াসের অন্য আর এক দিক। ১৯৫১ সালে সূচনা হয়েছিল প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা। প্রায় একই সময়ে গ্রহণ করা হয়েছিল গ্রামোন্নয়নের জন্য

বহুমুখী কর্ম প্রয়াসের এক অভিনব প্রকল্প- সমষ্টি উন্নয়ন কর্মসূচি। এই সমষ্টি উন্নয়ন কর্মসূচির মাধ্যমে দেশের ১৬ হাজার গ্রামের ১ কোটি ১০ লক্ষ লোকের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়। ১৯৫২ সালের ২ অক্টোবর মহাত্মা গান্ধীর জন্মদিনে গ্রামীণ স্তরের গ্রামোন্নয়ন প্রয়াসের এই কর্মসূচি চালু করা হয়েছিল দেশের ৫৫টি সমষ্টি উন্নয়ন ব্লকে।[১৩] এই কর্মসূচীর উদ্দেশ্য ছিল গ্রামবাসীদের পূর্ণাঙ্গ এবং সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমে মহকুমা স্তরের নিচে প্রশাসনিক ইউনিট ব্লক-স্তরের আওতায় সার্বিক গ্রামোন্নয়ন কর্মকাণ্ডের সূচনা করা। নিজস্ব সম্পদ ব্যবহার করে উন্নয়নের পরিকাঠামো তৈরি করার পাশাপাশি আধুনিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির মাধ্যমে গ্রামবাসীদের কৃষি, যোগাযোগ, পশুপালন, জনস্বাস্থ্য, নারীদেরশিক্ষা ও উন্নয়ন, কর্মসংস্থান এবং ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের ক্ষেত্রে সামগ্রিক বিকাশ নিশ্চিত করাই ছিল সমষ্টি উন্নয়ন ব্লক-এর কাজ।[১৪] এই কাজে গ্রামবাসীদের জন্য ব্লকের সরকারি কর্মী হিসাবে সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক এবং গ্রাম সেবকদের নিযুক্ত করা হলেও পল্লী উন্নয়নে মুখ্যত গ্রামবাসীদের নিজস্ব ও সমষ্টিগত উদ্যোগ সংঘটিত করাই ছিল তাদের কাজ। সমষ্টি উন্নয়ন কর্মসূচি চালু করার আগে নয়া দিল্লীতে ১৯৫২ সালের ৭ মে উন্নয়ন কমিশনারদের সম্মেলনের উদ্বোধনী ভাষণে জওহরলাল নেহরু বলেছিলেন, 'এই সমষ্টি উন্নয়ন কর্মসূচীগুলি আমার কাছে ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ ছিল কারণ সমষ্টি উন্নয়ন শুধুমাত্র বস্তুগত সাফল্যই লাভ করে না এর বাইরে এটি আমাদের ব্যক্তিস্বাতন্ত্রকে গড়ে তুলতেও সাহায্য করে, যা বৃহত্তর দৃষ্টিভঙ্গিতে আধুনিক ভারত গঠনে সাহায্য করবে।'[১৫] এছাড়া নেহরু মনে করতেন, সরকারি কাঠামো এবং অতীতের কার্যাবলী বর্তমান শিল্পের জন্য যথেষ্ট নয়। যার ফলে আমাদের বিভিন্ন দিক থেকে সমস্যার মুখোমুখি হতে হচ্ছে এবং আমাদের কাঠামোগুলি শিল্পের জন্য সামগ্রিকভাবে উপযুক্ত নয়। আমাদের সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গির দিক থেকে বিচার করলে দুধরণের অর্থনীতির বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়; সমাজতন্ত্র ও পুঁজিবাদ।[১৬]

স্বাধীনতার পর থেকে জওহরলাল নেহরু আর্থ-সামাজিক গুরুত্ব উপলব্ধি করে ক্ষুদ্র শিল্পের উন্নয়নের জন্য বেশ কয়েকটি ইতিবাচক পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন। শিল্পনীতি সম্পর্কিত ঘোষণা, পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় অর্থ বরাদ্দ, বিভিন্ন প্রচার, ক্ষুদ্রশিল্প সংস্থাগুলিকে সমর্থন, বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কের জাতীয়করণ প্রভৃতির মাধ্যমে সরকার ক্ষুদ্র শিল্পের জন্য অনুকূল পরিবেশ গড়ে তুলতে সচেষ্ট হয়েছিল।[১৭]

সূত্র নির্দেশ:

১. রাও, এম চলপতি, (২০১৮), (অনু. বীরেন সাহা), *আধুনিক ভারতের নির্মাতা জওহরলাল নেহরু,* নতুন দিল্লী: প্রকাশন বিভাগ তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রক, ভারত সরকার, পৃ. ৭৩।

২. ঘোষ, অমিয় কুমার, (১৯৪৯), 'বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণায় ভারত', *জ্ঞান ও বিজ্ঞান,* দ্বিতীয় বর্ষ, প্রথম সংখ্যা, কলকাতা: বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ, পৃ. ৫৪৭।

৩. Nehru, Jawaharlal, (1958). 'Changes in a Changing World', *Kurukshetra*, Vol. 6, No. 8, Delhi: Publication Division, p. 564.

৪. Raghunathan, N. (June 1-15, 1989). 'Small is Beautiful', *Yojana,* Vol. 33: No. 10, New Delhi: Publication Division, p. 21.
'Cottage and small scale industries are of very special importance in India. If we lack capital, we do not lack manpower, and we must use this manpower both to add to the wealth of the country and to reduce unemployment. It is important however for both cottage and small scale industries to use the latest technologies and to be coordinated with large scale industry.'

৫. National Small Industries Corporation, Int., (https://www.nsic.co.in/), Consulted on: 31.08.2019.

৬. Reddy, R. Jaya Prakash, (1991). *Problems and Development of Small Scale Industries in India,* New Delhi: Ashish Publishing House, pp. 4-6.

৭. রাও, এম চলপতি, (২০১৮), *পূর্বোক্ত,* পৃ. ২৫২।

৮. *তদেব,* পৃ. ৭৩।

৯. *তদেব,* পৃ. ২৫১-২৫২।

১০. Gandhi, M. K. (1946). *Hind Swaraj or Indian Home Rule,* Ahmedabad: Navajivan Publishing House, First Published 1938, p. 27.

১১. Shukla, Vivekanand, (2010). *Life and Vision of Jawaharlal Nehru*, Delhi: ABD Pub, p. 11.

১২. ভট্টাচার্য, ধীরেশ, (১৬-৩০ নভেম্বর ১৯৮৯), 'নেহরুবাদ ও সমাজতন্ত্র', *ধনধান্যে,* একবিংশ বর্ষ, দশম সংখ্যা (নেহরু সংখ্যা), কলকাতা: প্রকাশন বিভাগ, কেন্দ্রীয় তথ্য বেতার মন্ত্রক, পৃ. ২য় কভার।

১৩. Sawhney, K. (April 1954). (Agricultural Adviser to the Community Projects Administration), 'The Agricultural Programme', *Kurukshetra,* Vol. 2, No. 7, Delhi: Publication Division, p. 27.

১৪. Poojary, Janardhana, (October, 1989). 'Nehru's discovery of rural India', *Kurukshetra*, Vol. XXXVIII, NO.1, (Nehru Birth Centenary Special), Delhi: Publication Division, p. 6.

১৫. Jawaharlal Nehru's Speeches Vol-II, August 1949 - February 1953, The Publication Division Ministry of Information & Broadcasting Government of India, 1967, p. 52.
'These community projects appear to me to be something of vital importance, not only in the material achievement that they would bring about but much more so because they seek to build up the community and the individual and to make the latter a builder of his own village centre and of India in the larger sense.'

১৬. File No. 8/2 (Vol. II), Fortnightly letters of the hon'ble Prime minister to the Provincial Premiers 1949 to 1950, National Archives of India, (Latter – F.N.- 48, December 16, 1949, New Delhi).

১৭. Reddy, R. Jaya Prakash, (1991). *op.cit.,* pp. 4-6.